আত্মজীবনী, জীবনী রবীন্দ্রনাথ

শিশিরকুমার দাশ

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল কবিদের জীবনী তাঁদের কাব্যের মধ্যে প্রকাশিত ; তাঁদের জীবনের অন্য সব ঘটনা বা বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য হতে পারে কিন্তু কবি-জীবনীতে তাদের স্থান নিতান্তই অনাবশ্যক। উনিশশো চার সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি একটি আত্মজীবনী লেখেন । রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেই লেখাটি আত্মপরিচয় নামক প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভূত্ত হয়। এই প্রবন্ধের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। ... আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারও কোনো লাভ দেখি না।

সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও বৃত্তান্তের মধ্যে যে দ্বৈততার উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন তা যে তাঁর কাছে যথেষ্ট অস্বস্তিকর ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃত্তান্তকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি, সম্ভবও হয়নি। এই আত্মপরিচয়--এর শেষে ১৩১৭ সালে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। আত্মপরিচয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত গ্রন্থ নয়। তবু লক্ষণীয় হল যে এ-চিঠিটি বৃত্তান্তসর্বস্ব। জানি না এই পত্রটিকে আত্মপরিচয় গ্রন্থে অন্তর্ভূত্ত করার মধ্যে অজ্ঞাত সংকলক - সম্পাদকের রবীন্দ্রনাথের বৃত্তান্ত বিরোধিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ বা অনিচ্ছাকৃত বক্রোক্তি আছে কি না। তবে এ-কথা স্বীকার করা উচিত যে এই চিঠিতেও বৃত্তান্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তির চিহ্ন অতি স্পষ্ট। এখানেও তিনি লিখেছেন যে 'আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবনচরিত্র লিপিবদ্ধ করবার যোগ্য নহে।' কিন্তু তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, আর সেই সঙ্গে জানিয়েছেন 'তাহাদের প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি আমার মনে নাই।' তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছেন, রচনারও একটি ইতিহাস দিয়েছেন কিন্তু একটু জোরের সঙ্গেই বলেছেন 'সন তারিখের কোনো ধার ধারি না।' তারিখ একেবারেই নেই তা নয়, তাঁর জন্মতারিখ উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন যে তেইশ বছর বয়সে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৩০৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই তারিখটি অবশ্য ভুল। মৃণালিনীর মৃত্যু হয় ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯।

এই চিঠিতে মায়ের কথা আছে, আছে পিতার কথাও এবং পিতার সঙ্গে ডালহৌসি পর্বতে ভ্রমণকথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ। বিষয়কমের তাগিদে তাঁকে যে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে হত সে-কথাও রবীন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেননি। আরো উল্লেখযোগ্য যে এইসব ঘটনা বা বৃত্তান্তের সঙ্গে তাঁর রচনার যে সম্পর্ক আছে সে--কথাটিও তিনি জানিয়েছেন। ডালহৌসি ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখেছেন,'সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।'পল্লীগ্রামে ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখেছেন, '.... সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহ আমাকে ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়া

ছিল।' এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। জানিয়েছেন বিলাত ভ্রমণের কথা। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচার্যাশ্রম স্থাপনের কথা, জানিয়েছেন কয়েকজন বন্ধুর কথা। শ্রীশচন্দ্রমজুমদার এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা। প্রকৃতপক্ষে এই ছোট চিঠিটি বৃত্তান্তে ভরা। ফলত রবীন্দ্রজীবনীরএকটি মূল্যবান উপকরণ এই চিঠি। কিন্তু আরো একটি বিশেষ কারণে এটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের মনে কয়েক বছর আগে আত্মজীবনী- জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-চিন্তা দেখা দিয়েছিল সেই চিন্তাস্রোতের ইতিহাসে এই জীবনবৃত্তান্তের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যে-কোনো কারণেই হোক এই চিঠিতে তিনি বৃত্তান্তের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

পদ্মিনীমোহন নিয়োগী ১৩০৭ সালে, ভাদ্র মাসের কিছু আগে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার জন্য অনুরোধ করেন। প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী (৭) থেকে জেনেছি যে ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস থেকে প্রবাসী-তে 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হতে থাকে। সেই গ্রন্থ - সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কয়েকবৎসর পূর্বে' কেউ জীবনের ঘটনা জানতে চান। প্রভাতকুমারের অনুমান রবীন্দ্রনাথ এখানে বঙ্গভাষার লেখক-এর সম্পাদকের কথাই উল্লেখ করেছেন। প্রশান্তকুমার পালও (৮) এই অনুমান সমর্থন করেন। কিন্তু এই 'কেউ একজন' যে হরিমোহন হতে পারেন না এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিতে পারি না।
এই 'কেউ একজন' যিনিই হোন, যা গুত্বপূর্ণ তা হল যে হরিমোহনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তাতে জীবনের 'বৃত্তান্ত' বাদ দিয়েছিলেন আর পদ্মিনীমোহনের অনুরোধে যা লিখলেন তা হল বৃত্তান্তসর্বস্ব।
'আত্মপরিচয়' (বঙ্গভাষার লেখক) এবং বনস্মৃতি - অন্তর্বর্তকালে রচিত এই চিঠিটি তাই অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আরো বলা দরকার যে ১৩০২ সালে ভাদ্র মাসে সখা ও সাথী নামক এক শিশু - পত্রিকার সম্পাদক ভূবনমোহন রায় রবীন্দ্রনাথের জীবনী ছাপেন। রবীন্দ্রজীবনীর তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। অর্থাৎ এই রচনাটিকে এ 'ইন্টারভিউ' বলতে পারি। এই জীবনীতে নাকি তথ্যের কিছু ভুল ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পরবর্তী সংখ্যায় সেই ভুল সংশোধন করে দেন। প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'ইহাই বোধহয় কবির নিজ হস্ত রচিত প্রথম জীবনকথা।'(৯) 'নিজ হস্ত রচিত' অর্থাৎ আত্মজীবনী । জীবনের বৃত্তান্ত অংশে রবীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও সখা ও সাথী -তে প্রকাশিত জীবনকথায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের অভাব ছিল না। তিনি তথ্যের যোগান দিয়েছেন, তথ্যের ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন। পদ্মিনীমোহনকে লেখা চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই তাঁর জীবনীর একটি খসড়া তৈরি করে দিয়েছেন, যে - খসড়ায় জীবনী - রচনার প্রচলিত মডেলটিকে তিনি গ্রহণ করেছেন।

১৩০২ থেকে ১৩১৮ অর্থাৎ সখা ও সাথী-র জীবনী থেকে প্রবাসী-তে 'জীবনস্মৃতি'র প্রকাশ পর্যন্ত সময়ে জীবনী ও আত্মজীবনী সম্বন্ধে দুটো মডেল রবীন্দ্রনাথের সামনে দেখা দিয়েছে। প্রথম মডেলটি জীবনী - রচনায় মোটামুটি সর্বাধিক পরিচিত---জীবনের নানা ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা । দ্বিতীয় মডেলটি তাঁর নিজস্ব। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধে তার আত্মপ্রকাশ 'কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।' প্রথম মডেলের তথ্য-- ভিত্তি পারিবারিক কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ, বন্ধুবান্ধব, শত্রুমিত্রের নানা সাক্ষ্য ও মন্তব্য, বিভিন্ন কর্মস্থানের পুঁথিপত্র, নিজের এবং অন্যের চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাগজপত্র। রাবীন্দ্রিক মডেলে এই সমস্ত কাগজপত্র মোটামুটি পরিত্যক্ত। দু-একটি চিঠির ব্যবহার অবশ্য তিনি করেছেন। কিন্তু এর মূল ভিত্তি হল তাঁর কাব্য। কাব্য ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রচনা নাটক এবং গল্পকাহিনীকে তার অন্তর্গত করলে তাঁর জীবন-পরিচয় পরিবর্তিত হত কি না জানি না।

এ-বিষয়ে অন্যান্য মন্তব্য করার আগে আর একটি লেখার কথা বলা দরকার। লেখার নাম 'কবিজীবনী'। ১৩০৮ সালে আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই ১৯০১) প্রকাশিত। হ্যালাম টেনিসন লিখিত তাঁর পিতার জীবনী Alfred, Lord Tennyson: A Memoir (১৮৯৭) গ্রন্থের সমালোচনা। এই প্রবন্ধটিকে বলা চলে বঙ্গভাষার লেখক - এর প্রবন্ধে

প্রকাশিত জীবনীটির মডেল নির্মাণের প্রথম চেষ্টা। 'ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে' - এই মন্তব্য এক যুবক কবি- সমালোচকের প্রচলিত জীবনীরচনা -- পদ্ধতির একটি 'Critique'। তবে এটি যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনীরচনার প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনা তা বোধহয় বলা ঠিক হবে না, তিনি স্পষ্টতই কবিজীবনীকে অন্য সমস্ত মানুষের জীবন থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চান। বিশেষ করে 'কর্মবীর' ও কবিদের জীবনে, তিনি মনে করেন, বিশেষ পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে কবিদের জীবনচরিত অর্থহীন। শুধু মহাপুষের জীবনীই সংগত। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ 'বারোয়ারি - মঙ্গল' (চৈত্র ১৩০৮) নামক একপ্রবন্ধেইউরোপে জীবনচরিত্র - রচনার ধারাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন (ইউরোপকে 'চরিতবায়ুগ্রস্থ' বলেছেন), 'যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত্র সার্থক.... টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরাটেনিসনকে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত্র পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।'

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে জীবনীরচনার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা সংগত। তিনি যাঁদের কর্মবীর বা মহাপুষ মনে করেন তাঁদের জীবন রচিত হতে পারে কারণ তাঁদের জীবনে মানুষের প্রয়োজন আছে, কবির জীবনে কাহারও কোনো 'প্রয়োজন' নাই। তা সত্ত্বেও তিনি বলেন, 'দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।'
'টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে। তাহা সৎলোকের জীবন বটে কিন্তু তাহা কোনো অংশেই প্রশস্ত বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে। তাহা তাঁহার কাব্যর সহিত সমান ওজন রাখিতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অন্তর্বিরোধিতা এখানে স্পষ্ট। আমরা জানি পৃথিবীর সব কবি এক ধরনের নয়। দান্তের এবং টেনিসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে দান্তে 'ক্ষণজন্ম', 'কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল।' এখানে রবীন্দ্রনাথ জানান না যে কীভাবে তিনি জানেন যে টেনিসনের জীবন সৎলোকের জীবনমাত্র কিন্তু তা 'প্রশস্ত বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে', কীভাবে জানেন যে দান্তের 'কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল'। এটুকু জানার জন্যও তো চাই জীবনের ঘটনা, তথ্য বা বৃত্তান্ত।

'আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত্র নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাইকবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত।' বাল্মীকি ও কালিদাসের সম্বন্ধে গল্পপ্রসঙ্গে আরো বলেন 'এই দুটি গল্পই বলিতেছে, প্রতিদিনের কথাবার্তা চিঠিপত্র দেখাসাক্ষাৎ কাজকর্ম শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল্য নাই ; তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো-- তাহা কবির আয়ত্তের অতীত।'

এই গল্পগাথাগুলির মধ্যে অবশ্যই পাঠকসমাজের একটি বিশেষ সাহিত্যচিন্তা প্রকাশিত। মহাকবিদের কাব্যের উৎস হল দৈবীশক্তি প্রেরণা। মানুষের জীবনে দৈবশক্তির আবির্ভাবজনিত পরিবর্তন সাধুসন্ত কবিদের জীবনে ভক্তগণ বারবার উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেই তার নজির আছে, ভক্তির ইতিহাসে তাদের গুত্ব অপরিসীম। ভক্তের চোখে অবশ্য 'তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত'। রবীন্দ্রনাথ যখন এই গল্পগুলির মধ্যেই কবিদের প্রকৃত ইতিবৃত্ত পেয়েছেন তখন তিনি প্রাচীন কবিদের জীবনচরিত সম্বন্ধে আর 'চিরকৌতূহলী' কেন ? প্রকৃত ইতিবৃত্তের সঙ্গে যাঁর পরিচয় ঘটে গেছে তখন তিনি কেন আর 'সাময়িক' 'অনিত্য' ব্যাপারে কৌতূহলী হবেন ? অবশ্য হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, বরং প্রবলভাবেই মানবিক। কবিদের জীবনের শুধু 'অলৌকিক' মুহূর্ত নয়, স্বাভাবিক, প্রাত্যহিক, সাময়িক ঘটনাগুলিতে মানুষের কৌতূহল স্বাভাবিক। এমনকী বলা চলে যে জীবনী রচনা, তা সক্রেটিস বা বুদ্ধের, হিটলার বা চার্চিলের, চার্লি চ্যাপলিন বা ধ্যানচাঁদ যারই হোক না কেন, তার পেছনে আছে মূলত একটি কৌতূহল, অন্যকে জানা, বিশেষত খ্যাতিমানের জানা। মূলত সেজন্যই জীবনী লেখা হয়। যেখানে তথ্যের অভাব সেখানে কল্পনার সাহায্যে, অনুমানের ভিত্তিতে শূন্যতা ভরিয়ে নেওয়া

হয়। ক্রৌঞ্চ - মিথুনের কাহিনী কিংবা দস্যু রত্নাকরের কাহিনীর জন্ম সেই কৌতূহলের গঙ্গোত্রী থেকে , তথ্যের অভাবজনিত শূন্যতা থেকে। সেই কাহিনীগুলি প্রকৃত ইতিবৃত্তের দাবি করতে পারে না, তারা প্রকৃত ইতিবৃত্তের প্রতিবাদীও নয়, তারা এক স্বতন্ত্র কাহিনীজগতের অধিবাসী। আমাদের কাল ও সমাজ যেহেতু প্রকৃত এবং কল্পিত, বিশ্বাসযোগ্য এবং অলৌকিকতার দ্বৈত জগৎ সৃষ্টি করেছে, সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে এত জোরের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই কল্পিত কাহিনীগুলিও বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসিদ্ধ ইতিবৃত্তের বাইরে একটা প্রকৃত বৃত্তান্ত আছে, সেটাই কবির জীবনী।

জীবনী রচনার ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে শুধু 'মহাপুরুষই' নন, নানারকম মানুষের প্রতিই মানুষের কৌতূহল। সেজন্যই নানারকম মানুষই জীবনীর বিষয়, আর যাঁরা মহাপুরুষ নন তাঁদেরও আত্মজীবনী লেখা থেকে নিরস্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। ইতিহাস জুড়ে দেখা যাবে এক-একটি জীবনের প্রতি জীবনীকার তথা পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ অফুরন্ত। জনসন, বায়রন, শেলি, নেপোলিয়ান, রাণী ভিক্টোরিয়া, ডি. এইচ. লরেন্স ; আমাদের দেশে মাইকেল, বঙ্কিম কিংবা পরমহংসদেব, এঁদের জীবনী লিখিত হচ্ছে বারবার। যেন প্রত্যেক যুগের জীবনী-- রচয়িতাদের কাছে জীবনগুলি নতুন কৌতূহলের এবং নতুন চ্যালেঞ্জের বিষয়। গ্রিক ট্র্যাজেডির কাহিনীর মতো বিভিন্ন কালে বিভিন্ন লেখক তাদের নিয়ে নতুন নাটক রচনা করেছেন। 'প্রকৃত ইতিবৃত্ত'টা কিছুতেই জানা যাচ্ছে না।

আরেকটা তর্ক তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'কবির জীবন হইতে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্তা-কাজকর্ম কখনোই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না। কারণ, সেই - সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য ; রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্য-প্রকৃতির--- সমগ্র প্রকৃতির --- সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ, তাহা অন্যান কাজকর্মের মতো ক্ষণিকবিক্ষোভজনিত নহে।'

বাল্মীকি কেন, যে-কোনো কবিরই প্রাত্যহিক কাজকর্ম তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়, আমরা জানি কবিরা সবসময় কবি নয়, কোনো কোনো সময় কবি। বড় বড় কবিদেরও জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে বা তাঁরা অনেক কাজকর্ম করেন যা খুব একটা কবিজনোচিত নয়। কিন্তু অন্য সব কাজকর্মই 'ক্ষণিক বিক্ষোভজনিত' আর কাব্যমাত্রেই আর 'অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ', এ-এক আদর্শায়িত অবাস্তব জীবন। রবীন্দ্রনাথ যখন একথা লিখেছেন তখনও আমরা জীবনীর সঙ্গে মনস্তত্ত্বের, বিশেষ করে ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের সঙ্গে, পরিচিত হইনি। আধুনিক জীবনকারেরা কোনো ঘটনা বা তথ্যকে সাময়িক অনিত্য বা আকস্মিক চিত্তক্ষোভ-জনিত বলে উপেক্ষা করেন না, বরং সেগুলির কর্ম ও চিন্তার সম্পর্ক দেখতে পান, প্রবৃত্তি ও নিবৃতির দ্বন্দ্বের পরিচয় আবিষ্কার করেন। একথা অনস্বীকার্য যে মনস্তাত্ত্বিকরা অনেক সময়ই ভ্রান্ত পথে চালিত হন।* ফ্রয়েড নিজে ডস্টয়েভস্কি সম্বন্ধে পাঠকদেরর ভুল পথে চালিত করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা শেষ পর্যন্ত জীবন ও কাব্যের সম্পর্কের অনুসন্ধান করে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে, প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন থেকে অমিতাভ চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা, যা শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাইরের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নতুন সংবাদই দেয় না, উজ্জ্বলিত করে তোলে তাঁর অন্তর্জীবনও।***

* "Many fundamentalist Freudians, like Freud himself, referred speculation to scholarship, making confident assertions about the traumas suffered by their subjects in early childhood without sufficient evidence to support their theories." Anthony Storr, 'Psychiatry and Literary Biography', The Art of literary Biography, ed. By John Batchelor, Clasendar Press. Oxford, 1995, P. 77.

টেনিসনের সঙ্গে বাল্মীকি প্রসঙ্গ এনে রবীন্দ্রনাথ কারো প্রতি সুবিচার করেননি। কয়েক শতাব্দী ধরে বিতর্কিত এক মহাকাব্যের স্রষ্টা কোনো একজন ব্যক্তি নন, বহু কবির সৃষ্টি। বহু শতাব্দীর চিন্তাভাবনার সংগঠিত রূপ যে - কাব্যে, একটি সমাজের ধর্মনীতি এবং সাহিত্যকর্মের যা প্রেরণা, তার সঙ্গে অন্যান্য কবির কাব্যের তুলনা অসঙ্গত । বাল্মীকি যতটা ইতিহাসের তার চেয়ে বেশি পুরাণের, টেনিসন একান্তভাবেই ইতিহাসের। বাল্মীকির জীবনী তাই কিংবদন্তি , টেনিসনের জীবনী

ইতিহাস।
রবীন্দ্রনাথের মূল কথা হল, অবশ্য কবির জীবনচরিত্র একান্তভাবেই কাব্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। বংশপরিচয়, কবির পারিবারিক জীবন, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি সবই অবান্তর। 'টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত্র একটি লেখা যাইতে পারে--- বাস্তব - জীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা যাইতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথ ধরেই নিয়েছেন যে তথ্যভিত্তিক জীবনীর মধ্যে একটি স্থাবরতা আছে, একজন লোকের ভিন্ন ভিন্ন জীবনীসত্ত্বেও তাদের মধ্যে ঐক্য আছে, কিন্তু - যে - জীবনের ভিত্তি কল্পনা, সেখান 'লেডি শ্যালট ও রাজা আর্থারের কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণ থাকিবে', সেখানে 'টেনিসনের জীবন ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিত।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি নির্ভূল নয়। একজন লোকের একাধিক জীবনী যদি লেখা হয় তাদের মধ্যে অবশ্যই ঐক্য থাকে, অন্তত থাকাটাই স্বাভাবিক। এই ঐক্য মূলততথ্যের, জন্ম মৃত্যু ঘটনা, পারিবারিক জীবন, রচনা ও অন্যান্য কর্ম ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু যদি তথ্য সংকলনই জীবনীর প্রধান লক্ষণ বা লক্ষ্য হয় তা হলেও নতুন জীবনীর প্রাসঙ্গিকতা খর্ব হত না। তথা অপরিবর্তনীয় নয়, ফলে তাদের স্থির নিয়ন্ত্রণীশক্তি চিরকালের নয়। দ্বিতীয়ত শুধু নূতন তথ্য নয়, নূতন ও পুরাতন উভয় শ্রেণীর তথ্যেই নির্বাচনও প্রয়োগ জীবনীর সবচেয়ে বড় লক্ষণ। আমরা জানি যে, ব্যক্তির জীবন, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চোখে নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। শুধু তাই নয়, আকর্ষণীয় ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের বোঝার ও বিচারের paradigm গুলির বদলের ফলে তাঁদের জীবনী বারবার রচিত হওয়াই প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'কাব্যগত জীবনচরিত' বলেন তাও কি একটি স্থাবর রূপ ?

'কবিজীবনী' প্রবন্ধের তিন বছর পরে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়-এর অন্তর্ভূক্ত বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন। যে কাব্যগত জীবনচরিতের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল সেখানে। তবে এটি জীবনী নয়, আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনীর কোনো মডেল সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। টেনিসনের জীবনী কীভাবে লেখা সম্ভব তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'কবিজীবনী' --তে 'তাহাতে লেডি শ্যালট ও রাজা আর্থারের কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণ থাকিবে ; তাহাতে মার্লিনের জাদু এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আত্মজীবনী লিখতে বসে তাঁর কাব্যের মধ্যে উদ্ভাসিত বিভিন্ন কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণে উৎসাহী হননি। তাঁর এই কবিচরিতে কালিদাসের কালের সঙ্গে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের কাল, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ ওবৈদিক ভারতবর্ষের মিশ্রণের চিহ্ নেই। 'কবিচরিতে' যে - মডেলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার রূপায়ণের চেষ্টা এখানে নেই, কিন্তু একটি নতুন মডেল যে উপস্থিত করলেন তাতে ও সন্দেহ নেই। প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে এখানে তিনি যাকে বৃত্তান্ত বলেন তা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

'কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।' এই যে জীবনচরিত তার কেন্দ্রীয় বিন্দু হল তাঁর কাব্যরচনার পেছনে এক চালিকাশক্তির অস্তিত্ব। তাঁর কাব্যরচনায় তাঁর স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই---এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্বছিলনা।'২২ স্পষ্টতই এটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধি। এইটি যে যথার্থ কবিজীবনের সূত্র এমন কথা রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রাচীন 'প্রেরণা'তত্ত্ব অবলম্বনে তাঁর জীবনচরিত রচনা করেছেন কি না তা বলেননি কিংবা রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে ও কাব্যসৃষ্টির সম্পর্কের যে প্রাচীন ধারার ঐক্য অত্যন্ত স্পষ্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
তাঁর জবানবন্দি -তে সক্রেটিস বলেছেন, 'আমাদের বুঝতে বেশি দেরি হল না যে কবিরা জ্ঞানের দ্বারা কাব্যরচনা করেন না। এ-একপ্রকার স্বাভাবিক শক্তি এবং দৈবীপ্রেরণা। ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুষ এবং ত্রিকালজ্ঞ মধ্যে আমরা এইরকম লক্ষ

করি।'(২৩) সক্রেটিস ব্যবহৃত 'স্বাভাবিক শক্তি', ক্ষান বা 'সোফিয়া'--র বিপরীত। স্বাভাবিক শক্তি বা ফুসিস (আমাদের অ
ালঙ্কারিকদের ব্যবহৃত 'নৈসর্গিকী' কথাটির প্রতিবাদ) কাব্যের মূলে। অভ্যাস অথবা রচনার নিয়ম শিক্ষা করে কাব্যরচনা
করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন 'এনথেওস' বা প্রেরণা। এনথেওস - এর অনুবাদ করতে পারি 'অন্তর্দেবতা'। কবির
অন্তরে এক দেবতা প্রবেশ করেন, তার ফলেই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। 'এনথেওস'-র দুটি অর্থ প্রথমটি 'দেবতায় পূর্ণ', 'উদ্বুদ্ধ',
'আবিষ্ট' আর দ্বিতীয় অর্থ এক দৈবী - উন্মাদনা, divine frenzy । শুধু জবানবন্দি - তো নয়, ইান গ্রন্থেও সক্রেটিস
বলেছেন
ঈশ্বর কবিদের চিত্ত হরণ করে, দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুষ ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের মতোই তাঁদেরও আপনার আজ্ঞাবাহী কর্মীতে
পরিণত করেন, তাঁরা তন্ময় অবস্থায় যে অমূল্য উক্তি করেন তা তাঁদের নিজেদের কথানয়, তা ঈশ্বরেরই কথা, যদিও মনে
হয় কবি যেন আমাদের সঙ্গেই কথা বলছেন।
এই কথারই অনুবাদ কি পাচ্ছি না এই কবিতায়
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেলেহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কুল নাহি পাই,
কোথা থেকে যাই দূরে।
চিত্রা, 'অন্তর্যামী'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য
নহে।' রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে বললেও, সক্রেটিস সাধারণ সূত্র রচনা করেছেন সমস্ত
কবিদের সম্বন্ধে
মিউজ প্রথম মানুষকে উদ্ধাধিত করেন ... তাঁহারা উদ্বোধিত হন, আবিষ্ট হন, তারপর অপূর্ব কবিতা রচনা করেন। (মহাক
াব্যের কবিদের মতোই) গীতিকবিদের পক্ষেও ইহার সত্য। Corybantes পূজাকালীন নৃত্যরত অবস্থায় চে তন অবস্থায় থ
াকেন না। একবার সুর ও ছন্দের মধ্যে ডুবিলে তাঁহারা Bacchant-এর মতোই আবিষ্ট হইয়া পড়েন।

সক্রেটিস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে কবিরা নিজে এইরকম উক্তি করেছেন। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন কলচিস - নিব
াসী তুন্নিখুস (Tynichus) নামক এক কবির কথা। এইরকম তথ্যের ভিত্তিতে সক্রেটিস বললেন এইসব সুন্দর কবিতা ম
ানুষের নির্মাণ নয়, এগুলি অলৌকিক রচনা, দৈবী - দান ; প্রত্যেকটিই দেবতার আবেশে রচিত। সক্রেটিস ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ
katexouevol- এর ইংরেজি অনুবাদ হল possessed.* দৈবীশক্তি কবির ওপর এসে ভর করে, আর কবি তাই লেখেন।
রবীন্দ্রনাথও বলেন কাব্য রচনা ব্যাপারটার উপরে 'আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।'

প্লেটো যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের উন্মাদনার কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি হল দৈবী উন্মত্ততা, মিউজ-এর ভর করা--
Katokoche- আর কবিতার উৎপত্তির জন্য তা অপরিহার্য। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই মিউজ এবং কবির সম্পর্ক সুপ্র
াচীন। এক প্রাচীন কাহিনীতে আছে যে একজন মিউজ দেমেদোকাসকে ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি হরণ করেছিলেন,
কিন্তু তার পরিবর্তে দিয়েছিলেন সংগীত রচনার শক্তি। হেসিঅড বলেছেন মিউজদের কৃপায় কেউ ***
There is Third form of possession or madness, of which the Muses are source. This seizes our tender, virgin soul and stimulates it to rapt passionate expression especially in lyric poetry, glorifying the countless mighty deeds of ancient time for the instruments of posterity. But if any

man come to the gates of poetry without the madness of the Muses, persuaded that skill alone wi make him a good poet, then shall he and his works of sanity with him be brought to nought by the poetry of madness, and behold there place is nowhere to be found. Tr. By R. Hackforth, included in the Collected Dialogues of Plato Ed. By Edith Hamilton and Huntington Cairns, Princeton University Press, 1961, p. 492.

***কেউ কবি। যেমন জেউসের কৃপায় কেউ কেউ রাজা। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিবর্তন বা মূর্খ কালিদাসের সরস্বতীর বরে কবিত্বশক্তি লাভ বৃহত্তর অর্থে এই মিউজ তত্ত্ব বা কাব্যরচনায় এক অলৌকিক শক্তির উপস্থিতির তত্ত্বের অন্তর্গত। E.R. Dodd's লিখেছেন প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতিতে এই অলৌকিক শক্তির প্রসঙ্গ ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত like all achievements which are not wholly dependent on the human will, poetic creations contain an element which is not 'chosen' but given, and to old Greek poetry 'given' signifies 'divinely given' (২৬) এই কথাগুলি মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আর অভিনব মনে হয় না।

তাঁর কাব্যের চালিকাশক্তির নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা, অবশ্য শুধু কাব্যের নয়, তাঁর সমগ্র জীবনেরও। আমাদের প্রাচীনেরা কাব্যের সূচনায় দেবতার স্মরণ করেছেন কিন্তু একথা বলেননি যে তাঁরা শুধু যন্ত্র, দেবতাই যন্ত্রী

আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছে মর্মমাঝে ?
রবীন্দ্রনাথ, 'অন্তর্যামী', চিত্রা

হোমার ইলিয়াড কাব্যের প্রারম্ভে এক দেবীকে (থেয়া) আহ্বান করেছেন কাহিনী বর্ণনা করার জন্য। দেবীই কাহিনীটি জানেন, কবি শুধু যন্ত্র। যেমন দেলফির মন্দিরে যে দৈববাণী হত পরবর্তীকালে এই দৈববাণীই হোক বা মিউজের প্রেরণাই হোক তা হয়েছিল একটা প্রথা ইউরোপীয় সাহিত্যের মিউজ হয়ে উঠেছেন শুধু কাব্যের নয়, জ্ঞান ও দর্শনের দেবী।কার্টিয়াস এ সম্পর্কে বলেছেন..'the invocation of the Muses must serve to prove the poet's pedagogical vocation'। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্বে এই মিউজ তত্ত্ব পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠে ছেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো কয়েকটি চিন্তা।

প্রথম চিন্তা কাব্যের প্রেরণা। সক্রেটিস যাকে বলেছেন 'এনথেওস্'। রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনায় নিজের কর্তৃত্বের বোধ, স্বাধীন্তার বোধ অস্বীকার করলেন। যাকে তিনি তাঁর কবিজীবন বলেন, সেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শূন্য--- 'এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্যসম্পূর্ণ হয় নাই -- সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পুর্বে জানিতাম না।'

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যদি শুধু তাঁর কাব্যের রচয়িতা হতেন তা হলে অবশ্য আমরা তাকে গ্রিক মিউজ - দের নবরূপ বলতে পারতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই দেবতাকে শুধু তার কাব্যের চালিকাশক্তি বলছেন না, তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মের চালনাকারী বলে দাবি করেছেন

'শুধু কি কবিতা - লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহানহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে , তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। ... এইযে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।'

এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথ অহমিকা লক্ষ করেছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সম্বন্ধে অপৌষেয়তা দাবি করেছেন। আরো দিক থেকে বলা চলে এখানে রবীন্দ্রনাথ অহং - এর সমস্ত ভূমিকা পরিত্যাগ করেছেন, সেদিক থেকে বিনয়ের এমন নিদর্শন আধুনিক কাব্যের ইতিহাসে কম আছে। আদৌ আছে কি ? আত্মরচিত অহংবোধকে বাদ দিয়ে অসম্ভব । অথচ 'একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন' ---অর্থাৎ আত্মশক্তি বা পুষকারের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি বা আত্মবিলুপ্তির বোধ আমাদের মন্ত্র সাধনের রচনায় দেখি। 'তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি',(৩০) এই বাক্যে উচ্চারিত অহংবোধের বিসর্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তঁার কাব্যে অপৌষেয়তা দাবি করেছেন কি না এ আমাদের মূল প্রশ্ন নয়। আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি তঁার জীবনের কোনো পরিচয় দিতে পেরেছেন ? যে-কোন ধার্মিক ব্যক্তিই বলতে পারেন, আমাদের সকলের জীবনই ঈশ্বর পরিচালিত। এটি ধ্রুব সত্য। এটি ধ্রুব সত্য। আমি তা জানি কিংবা জানি না তাতে সত্যের পরিবর্তন ঘটে না। ঈশ্বরই আমাদের জীবনকে, আমাদের প্রত্যেকটি কর্মকে চালিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই জীবনদেবতাকে ঈশ্বর বলতে রাজি নন ---

ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি দ্বিলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই---যিনি বিশেষ রূপে আমার, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারেননা চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।
রবীন্দ্র - সমালোচক মহলে এ-নিয়ে তর্ক - বিতর্ক এবং ব্যাখ্যাদি প্রচুর হয়েছে । তার পুনরাবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে ঈশ্বর বা দ্বিদেবতা প্রত্যয় থেকে স্বতন্ত্র করে ব্যক্তিগত দেবতারূপে যে দাবি করেন তার মূলে আছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ। তাঁর নিজস্ব দেবতার শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'আমি' নামক এই নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে লোক-লোকান্তর যুগ-যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া আনিয়াছেন ... চিত্রা কাব্যে আমি তাহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি।'
জীবনদেবতার সূত্র তা হলে 'আমি' ভাবটির অখণ্ডতা। গীতায় আত্মাকে, নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ (২/২৪) বলা হয়েছে, কিন্তু 'আমি' ভাবটির কোনো চলমানতার বোধ সেখানে নেই। হিন্দুচিন্তা ভিন্ন অহং বা আমি ছিলাম না তা নয়। ত্বম্ বা তুমিও ছিলে না তাও নয়। জনাধিপতিগণ ছিলেন না তাও নয়, এরপরে আমরা থাকব না তাও নয়। কিন্তু যা থাকবে তা তো নিত্য আত্ম, 'আমি' নয়। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন সেই বিশেষ দেবতা যা তাঁর নিজের দেবতা, যিনি বিশেষভাবে তাঁর জীবনটিকেই গড়েছেন এবং গড়েছেন ---কিন্তু 'প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারা', 'বৃহৎ স্মৃতি' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ যে অর্থেই ব্যবহার কন তার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির গভীর অনুষঙ্গ। তিনি বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী কি না এ প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু জন্মান্তরবাদ বা নানাজন্মের স্মৃতিতে বিশ্বাস যে তাঁর অন্তর্জীবন বা কবিজীবনের কেন্দ্র তা তো অস্বীকার করা যাবে না। 'আমি' বিভিন্ন জন্মের মধ্যে দিয়ে বর্তমানেএসে পৌঁছেছি। পুরোনো জন্মের সব কথা মনে নেই, কিন্তু সেই জড়িত, তেমনই যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধিজাত তাতে সন্দেহের কারণ দেখি না। একটা স্মৃতি যে ক্রিয়াশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'এক সময়ে যখন আমিএই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত' --- ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ যে বলছেন তা এক পূর্বজন্মের স্মৃতি। কখনও বলেন 'খানিকটা মনে পড়ে' আবার কখনও বলেন 'আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন'... ইত্যাদি।

অতএব রবীন্দ্রনাথ যে-জীবনের (এবং জীবনীর) কথা বলেছেন তা শুধু এই জন্মের নয়, তা বহুজন্মের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রকাব্যে যে প্রকৃতি ও মানুষের ঐক্য সন্ধান, নিসর্গের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তা শুধু একটি ব্যক্তির বিশেষ জন্মের প্রবণতা নয়, তা বহু জন্মের স্মৃতির ফসল, জননান্তরানি সৌহার্দ্য কাব্যের নিয়ন্ত্রণী শক্তি, জীবনের লক্ষ্য দিশারী, আমিত্বের স্মৃতিকে কাল থেকে কালে চালিত করার কর্ণধার এই তিনটির একীভূত রূপ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা।

এই জীবনদেবতাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের যে - পরিচয় দিলেন তাকে সূত্রাকারে যদি বলতেচাই, তা হলে দাঁড়ায় এই যে তাঁর কাব্যকর্মে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই, তা চালিত হচ্ছে এক দৈবী শক্তিতে। শুধু কাব্যকর্ম নয় তাঁর

জীবনও চালিত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের দিকে, এই অভিপ্রায় তাঁর কাছে ক্রমশ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, যা কিছু ত াৎপর্যহীন মনে হয়েছিল প্রথমে ক্রমশই তাৎপর্য পরিস্ফুট হচ্ছে, আর তৃতীয়ত এই জীবন শুধু একটি বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে আবদ্ধ নয়, তা বহুযুগ পূর্ব থেকে বাহিত, তা এক জন্মের নয়, বহু জন্মের।

রবীন্দ্রনাথ যে-কবিজীবনীর কথা বলেছিলেন টেনিসনের জীবনীর সমালোচনায়, এই কি সেই কবিজীবন? অর্থাৎ প্রত্যেক কবি তথা প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষেত্রে কি এইরকম একটি জীবনদেবতার কথা ভাবা যেতে পারে? যেহেতু জীবনে, সমস্ত খণ্ড, সমস্ত অসংগতি, সমস্ত পরস্পরবিরোধী ঘটনাকে একটি পরিপূর্ণতা বোধের মধ্যে ঐক্যসূত্রে গাঁধা সিহজ নয়, তাহলে কি এ-কথাও বলা চলে জীবনদেবতা সমস্ত খণ্ডকে অখণ্ডতায়, সমস্ত অসংগতিকে সংগতির মধ্যে চালিত করেন না ? অথবা বলব যে - জীবনদেবতার অভিপ্রায় আমরা জানি না, প্রকৃতপক্ষে জীবন তাঁর দ্বারাই চালিত, অতএব আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা অবান্তর । আমরা যাঁরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের দ্বারা জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করতে অপারগ কিংবা প্রতিবাদী তাঁদের পক্ষে এই জীবনী একটি মনোরম কল্পনা ছাড়া অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন এক নিরবয়ব জীবন, ইতিহাসবিচ্ছিন্ন, দৈবীশক্তিচালিত, বিশেষ অভিপ্রায়মুখী। কবির যে-পরিচয় পরিস্ফুট হচ্ছে এই 'আত্মপরিচয়' -এর ব্যাখ্যায় তা এক সমন্বয়মুখী, জীবনের সমগ্রতাসন্ধানী মানুষ নিজের জীবনকে যিনি প্রবহমান জীবনের সঙ্গে অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে, যুক্ত করে দেখতে চান এমন এক মানুষের জীবন, যার বিশ্বাস জড় ও চৈতন্যের গভীরতর ঐক্যে। প্রকৃতির মোহকে যিনি বন্ধন মনে করেন না, বরং এই মোহেই যার মুক্তি আর নিজের জীবনের মধ্যে যিনি এক ব্যক্তিগত দেবতার অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতিতে বিশ্বাসী। একে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন, জীবন ও কাব্যের এক তা ত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কবির জীবন নয়। কবির জীবন যদি কাব্যই তা হলে তার স্বতন্ত্র জীবনীরচনা অনাবশ্যক এবং অবান্তর। জীবনদেবতা তত্ত্ব হিসাবে অভিনব কিছু নয় এবং তাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনী রচনা করতে সমর্থ হয়েছে একথাও বলব না। যে-বৃত্তান্তকে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে বাদ দিয়েছিলেন তার পেছনে একটা অস্বস্তি, এই বুঝি তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাসবিচ্ছিন্ন শুদ্ধতায় মালিন্যের স্পট লাগবে। কোনো জীবনীকারই কবির জীবনকে তার কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কথা ভাবেন না। যে টেনিসনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও বৃত্তান্তের পার্থক্য টানতে চাইছিলেন সেই তিনিই (টেনিসনই) নাকি বলেছিলেন,

"The less you know about a man's life the better. He gives you his best in his writing. I thank God day and night that we know nothing about Shakespeare."

কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি অস্বীকার করতে পারেননি বৃত্তান্তের দাবি। পুত্রকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন এমনভাবে যেন তাঁর জীবনী লেখা হয়, যাতে পরবর্তী জীবনীর, বিশেষ করে unauthentic biography -র প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। জীবনীক ারদের নিরস্ত করার উপায় হল শুধু একটি আত্মজীবনী লেখা নয়। জীবনী লেখার সমস্ত উপকরণ, দলিল, চিঠিপত্র, ড ায়েরি সব নষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু আত্মজীবনীও যেহেতু সব বৃত্তান্ত প্রকাশ করে না, নির্বাচন করে সূক্ষ্মবিশ্লেষণে তাঁর ফাঁ াকগুলো ধরা পড়ে যায়। বাল্মীকি ও কালিদাসের জীবন সম্বন্ধে কিন্তু জানা এখন অসম্ভব কিন্তু আধুনিক যে-জগতে বাস করি তাকে বলা চলে তথ্যসমুদ্র। তথ্যের কিছু ফেনা, কিছু লবণ মানুষের শরীরে থেকেই যায়। তথ্যপুঞ্জ থেকে আধুনিক জীবনীকার শার্লক হোমসের মতো ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের অনুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণে আত্মগোপনকারী ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করবেনই। টেনিসনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'কবিজীবনী' ও 'আত্মপরিচয়'--এর প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। জীবনীর দাবি এমনই প্রবল যে ---'বাহির হইতে দেখো না অমন করে / আমায় দেখো না বাহিরে', এই কণ মিনতি অথবা নিষেধ আমরা মানতে পারিনি। এমনই তীব্র অনুসন্ধিৎসা যে শেষপর্যন্ত বৃত্তান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন রবীন্দ্রনাথও। অথবা সমর্পণ নয়, শু হল জীবনব্যাপী এক দ্বন্দ্ব। 'আত্মপরিচয়' থেকে জীবনস্মৃতি এক জটিল যাত্রা।

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটি লেখার কয়েকবছর পরে লেখা হয় জীবনস্মৃতি । জীবনস্মৃতি আর যাই হোক রবীন্দ্র -কথিতকবিজীবনী নয়। জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তটা বাদ দেবার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাবেননি। বঙ্গভাষার লেখক-এ 'অ াত্মপরিচয়' প্রকাশিত হবার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের জীবনী-চিন্তায় কতটা প্রভাব ফেলেছিল জা নি না। কিন্তু বৃত্তান্তহীন জীবন-কথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা কিছুটা শিথিল হয়েছিল মনে হয়। জীবনস্মৃতি-র মডেলের

সঙ্গে আত্মপরিচয়-এর মডেলের ব্যবধান মেপ্রতিম। এক নিরবয়ব, ইতিহাসবিচ্ছিন্ন, ঈশ্বরচালিত কবিজীবন ও ধর্মজীবনের পরিবর্তে দেখা দিল মানুষের সুখদুঃখের জগৎ। তুচ্ছ-- অকিঞ্চিৎকর, আনন্দ-কৌতুকের জগৎ ; সেখানে এক অতীতকে স্মৃতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আবরণ থেকে উদ্ধার করে আনার সহজ প্রচেষ্টা; তত্ত্বকথার বদলে পাওয়া গেল জীবন্ত কাহিনী। রক্তমাংসের মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাসে চঞ্চল, একটি স্মৃতিচিত্রশালার নির্মাণ। সেইসঙ্গে কাহিনীর কথকের বাক্‌চাতুর্য, বিবরণকুশলতা, বর্তমান ও অতীতের ধাক্কাধাক্কিকে ঠিকরে ওঠা কৌতুকচ্ছটায় ইতিহাসের পুনর্জ্জীবন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাটিকে অবশ্য ইতিহাস বলে মানতে রাজি নন। 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে--তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' রবীন্দ্রনাথের মনে এখনও অবিচলিত হয়ে আছে এক 'অদৃশ্য' শক্তির উপস্থিতি । এখনও তিনি 'বৃত্তান্তের' কাঠামোকে পুরো মেনে নিতে পারছেন না। যাকে আমরা সাধারণ পাঠক বলব 'বৃত্তান্ত' বা ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলতে চান স্মৃতি। ইতিহাস আর স্মৃতি এক নয়। ইতিহাস তথ্যাশ্রিত এককালানুক্রমকিতার বোধ, কার্যকারণে অন্বিত ঘটনার স্রোত ; স্মৃতি মানুষের একটি বিশেষ শক্তি, অতীত ঘটনাকে মনে ধারণ করার শক্তি এবং প্রয়োজনে তার পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা। এই প্রসঙ্গটি দার্শনিকরা নানাভাবে চিন্তা করেছেন বের্গসঁর কথা উল্লেখ করতে পারি The past survives under two distinct forms : first in motor mechanism, Secondly in independent recollection. পুনরাবৃত্ত স্মরণক্রিয়াকে বের্গসঁ অভ্যাসগত স্মরণক্রিয়া বলেছেন এবং বৌদ্ধিক স্মরণক্রিয়াকে বলেছেন যথার্থ স্মৃতি। স্মৃতির মূলে আছে ধারনক্রিয়া ও পুনরুদ্রেক। দুটি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র দুটি ক্রিয়া। কিন্তু পাঠকের কাছে এই স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য যেতে হবে রচনার বাইরে, অন্য তথ্য ও অন্য দলিল - দস্তাবেজের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তথ্যগুলিকে কোনো সত্য মূল্য দিতে চাননি, তাদের তিনিসাহিত্যের সামগ্রী রূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, ইতিহাসের তথ্য রূপে নয়।

'উত্তর রামচরিতের প্রথম অঙ্গে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে-ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর, তা সম্পূর্ণ সত্য নহে।' রবীন্দ্রনাথের এ-কথা ভুল নয়, কিন্তু সীতার জীবনের সঙ্গে চিত্রগুলির যোগ ছিল বলেই সে-চিত্রগুলি ইতিহাসের সামগ্রীও বটে, তা একজন ব্যক্তি ও তাঁর জীবনের অতীত ঘটনার স্মৃতি এবং পুনরুদ্রেক। তাদের মনোহারিত্ব অবশ্যই তাদের নির্বাচনের ওপ্রদর্শন বা রূপায়ণ-কুশলতার এমনকী ঘটনার কালানুক্রমিকতায়---ছবিগুলির সজ্জায় যে কালানুক্রমিকতা নিঃসন্দেহে এক ইতিহাসবোধ-সঞ্জাত। ছবিগুলির অবলম্বন করে সীতার জীবনকাহিনীও বলা হয়েছে চিত্রসজ্জায়, শুধু তাদেরঅঙ্কন-কুশলতা বা ভাবোদ্রেক ক্ষমতাই লক্ষ্য হলে চিত্রগুলি কালানুক্রমিক ঘটনার রূপায়ণ হিসেবে চিহ্নিত হত না। তাদের মনোহারিত্ব তাদের সত্যমূলকতায়-ও বটে। এই জন্য জীবনী ইতিহাসের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রচেষ্টা হল জীবনস্মৃতিকে ইতিহাসের (অর্থাৎ জীবনীর ক্লাসিকাল মডেল) থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্যরূপে প্রতিপন্ন করা।

এই সময়েই অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রভক্তদের অগ্রগণ্য। একটি বই লিখলেন, সেটি রবীন্দ্রনাথের জীবনী-আত্মজীবনী, যেটি চিন্তাপরম্পরায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অজিতকুমার চক্রবর্তী একটি বই লেখেন। বইটির নাম রবীন্দ্রনাথ (২৫ বৈশাখ ১৩১৮)। ৭মে ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রোৎসবে এটি পাঠিত হয় এবং পরে প্রবাসী- তে ছাপা হয় এবং পরের বছর পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।৩৬ এই গ্রন্থ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে অজিতকুমার তাঁর জীবনের নানা ঘটনা বা 'বৃত্তান্ত' জানার জন্য কথাবার্তা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'অজিত আমার জীবন বৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনারদিনক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে।'

এই প্রবন্ধটি প্রত্যক্ষভাবেই 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধের মডেলকে অনুসরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যে-জীবনীর কথা বলেছিলেন তা নির্দিষ্ট পরিণতির অভিমুখী । জীবনদেবতা কবির জীবনকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর সমস্ত ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেছেন এক তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্যের অভিমুখে। রবীন্দ্র - নির্দেশিত জীবনী এই teleology -র দ্বারা শাসিত। অজিতকুমারও এই teleology--কেই রবীন্দ্রজীবন তথা কবিজীবনীর মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে। সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা-অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়-- সেইজন্য কবির বা সাহিত্যিকের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভালো মানে পরিণতির ভালো।

রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনী থেকে জীবনের সমস্ত 'বৃত্তান্ত' বাদ দিতে চেয়েছিলেন। অজিতকুমার জীবনীরচনায় ইতিহাসের আদর্শকে অস্বীকার করলেন না, বরং 'জীবনচরিত ও কাব্য উভয়কেই একত্রে' মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। ফলে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে বাদ দিতে হল না, বরং বৃত্তান্ত ও কাব্যের সম্পর্ককে স্বীকার করে নিলেন। অজিতকুমার অবশ্য প্রচলিত অর্থে জীবনী লেখেননি, কিন্তু কবির অন্তর্জীবন নিয়ে লেখার চেষ্টাও এই প্রথম, কাব্য ও জীবনের সম্পর্ক সন্ধানের চেষ্টাও এই প্রথম।

অজিতকুমার স্থির করে নিয়েছিলেন যে কোনো একটি লেখাতেই রবীন্দ্রনাথের 'সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত হইয়া আছে।' 'প্রভাতসংগীত' কবিতাটিকে তিনি সেই লেখা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। 'অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে,সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনা' ----এই কথা বলেছেন অজিত কুমার। আর সেই কথাটি প্রমাণ করার জন্য তিনি রবীন্দ্রজীবনের নানা ঘটনা ও কাব্যাংশ ব্যবহার করেছেন তথ্যহিসাবে। তথ্যের আলোয় যদি জীবনের মূলভাবটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে --- আর এই তথ্য বলতে যদি বোঝায় কাব্য, এই তথ্যের সঙ্গে জীবনের নানা ঘটনার সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়, তা হলে স্বভাবতই সেই ঘটনাগুলি আর কাব্য নিরপেক্ষ থাকে না। এবং রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে ঘটনাগুলি কারো প্রয়োজনে লাগে না এই মতও শিথিল হয়ে পড়ে। তথাকথিত বাইরের ঘটনাগুলিই কবিকে বোঝার জন্য গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, শুধু গুত্বপূর্ণ নয় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অন্তত অজিতকুমারের রবীন্দ্রনাথ তাই প্রমাণ করে। তাঁর আলোচনা শুই হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে একটি বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে উপস্থিত করে। তাঁর আলোচনার সূত্রপাত 'আমাদের দেশ', 'আমাদের দেশের সমাজজীবন', তার ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপন। আমাদের 'বহুদিনের সুপ্ত দেশ' একদিন যে হঠাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার ধাক্কায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে এ-কথাটা অজিতকুমারের কাছে গুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং জীবনে 'বি্ব - উপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা'-র সঙ্গে অজিতকুমার সম্পর্ক খুঁজেছেন আমাদের সমাজের পরিবর্তনজনিত চাঞ্চল্যের সঙ্গে।

আমার সন্দেহ রবীন্দ্রনাথ -এর কাঠামো রবীন্দ্রনাথকে জীবনীতে এবং কাব্যলোচনায় বৃত্তান্তের ভূমিকা সম্বন্ধে নতুনকরে ভাবতে বাধ্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যেমন তাঁর কাব্য নিরপেক্ষ হতে পারে না, তাঁর কাব্যালোচনাও যে জীবনের বৃত্তান্ত নিরপেক্ষ হতে পারে না, এই সহজ কথাটি নৈপুণ্যের সঙ্গে অজিতকুমার প্রমাণ করেছিলেন। তার ফলে বৃত্তান্তের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনস্মৃতি মোটামুটি সমকালীন রচনা এবং রবীন্দ্রনাথ রচনার সময় অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। ১৩১৭ সালের চৈত্রমাসে লেখা এক চিঠিতে (চিঠিপত্র ৪/পত্র ৩) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি তখন মধ্য জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাও ব্যাখা করেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জীবন ও কাব্যের সম্পর্কের মূল্যে এখন আর অবি্বাসী নন। আগেই বলেছি অজিতকুমারের রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত মডেলের জীবনী নয়। কিন্তু জীবনীরচনায় প্রচলিত পদ্ধতিগুলি তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন। প্রথমত, তিনি জীবনীর বিষয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য, দ্বিতীয়ত তিনি বিষয়ীর চিঠিপত্র তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তৃতীয়ত কবিজীবনীর উপকরণ হিসেবে তাঁর কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধবলীর বি্লেষণ করেছেন এবং সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনা তথা বিষয়ীর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গে বিষয়ীর কর্মজীবনের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের জীবন ; শৈশব-কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত নানাঘটনায় গাঁথা জীবনের অন্তরঙ্গ বিবরণ এর আগে কেউ লেখেননি। পরবর্তী জীবনীকারেরাও এই বিররণের শক্তি অতিক্রম করতে পারেননি। এই প্রথম রবীন্দ্রজীবনী, যেখানে রবীন্দ্রজীবন রূপায়িত হয়েছে এক স্তরান্বিত ঊর্ধবায়ন হিসেবে। যতই অগ্রসর হয়েছে সময়, ততই বিচিত্র শক্তিতে, বিচিত্র রূপে উন্মোচিত পরিপূর্ণ জীবন তাহার সম্মুখে স্তরে স্তরে স্তবকে এমন করিয়া উদঘাটিত হইল।' রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের স্মৃতি থেকে আরম্ভ করে

বিদ্যালয়ের অস্বস্তিকার জীবন। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, বোলপুর থেকে ডালহৌসি পাহাড়ের ঝরনা, পিতার সঙ্গে ভ্রমণ, মাতৃবিয়োগ, সাহিত্য ও গীতচর্চা, বিলাতযাত্রা, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, সদর স্ট্রিটে সূর্যোদয়, গাজিপুরে অবস্থান, জমিদারের কাজকর্ম দেখা, সাধনা -র জন্ম ও গল্পগুচ্ছের সূত্রপাত, শিলাইদহে বাস, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মবিকাশ, দর্শন সকল বিষয়েই উৎসাহ ও যোগ্যতা, স্বাদেশিক চিন্তা ও কর্ম, 'কবিজীবনকে নিঃশেষিত করিয়া... নূতন আধ্যাত্মিক জীবনে' জন্মলাভ, বোলপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং হঠাৎ সেই আন্দোলন থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া --- রবীন্দ্রজীবনের সমস্ত মূল্যবান বৃত্তান্ত এখানে স্থান পেয়েছে, আর তাদের মধ্য দিয়ে অজিতকুমার লক্ষ্য করেছেন 'স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে' উদ্‌ঘাটিত এক 'পরিপূর্ণ জীবন।'

কী আমাদের প্রত্যাশা জীবনীকারের কাছে ? জীবনীকারের একটা প্রশ্ন, নৈতিক প্রশ্ন। কী অধিকার আছে তাঁর অন্যের জীবনের ব্যক্তিগত পরিসরে প্রবেশ করার ? আধুনিককালে রচিত বহুজীবনীতে এই প্রশ্নটিকে এভাবেই সমস্যায়তকরা হয়েছে। হেনরি জেমসের বিখ্যাত গল্প The Aspern Paper (যার বিষয় হল শেলির প্রেম পত্র) সেখানে এক মার্কিণী গবেষককে বলা হয়েছে a publishing scoundree. ইউলিয়াম গোলডিং - এর The Paper Man উপন্যাসে, এ. এস. বায়াট (Byatt)-এর উপন্যাস Possession : A romance -এ জীবনীকারদের রূপায়িত করা হয়েছে ব্ল্যাকমেলার কিংবা তথ্যসন্ধানী গোয়েন্দা হিসেবে। ব্যক্তিগত জীবনের নিভৃত জগত, উদ্‌ঘাটনের আদর্শ অবশ্য বাঙালি জীবনীকারেরা গ্রহণ করেননি। আর অজিতকুমারের প্রয়োজনও হয়নি। এই নিভৃত জগতের ইঙ্গিত তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকেই গ্রহণ করেছেন।

জীবনীকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা সত্যতার। অজিতকুমারকে নির্ভর করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির ওপর।অন্য কারো কাছ থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহে সাহায্য পাননি, কোনো কোনো ঘটনার সাক্ষী অবশ্য তিনি স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা ছাড়া, হয়তো অজিতকুমার জীবনস্মৃতি -এর পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগও পেয়েছিলেন। এর বেশি উৎস ছিল না তার।

জীবনীকারের কাছে আমাদের আরো একটি প্রত্যাশা আছে। খ্যাতিমানের আকর্ষণীয়তাকে দিয়ে পাঠককে কৌতূহলী করে তোলা। অজিতকুমার যাঁর জীবনকথা বলেছেন তিনি অবশ্যই সমকালীন বাংলাদেশের এক খ্যাতিমান কিন্তু আজ আমাদের সময়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিপুল খ্যাতি তার তুলনায় পঞ্চাশ বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি নিষ্প্রভ। অজিতকুমার যখন এই প্রবন্ধ পাঠক করেন তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৌতূহল ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে আবদ্ধ। আজকের পাঠকের চোখে যে-রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত সেই পরিপ্রেক্ষিতে অজিতকুমারের বহু মন্তব্যকে নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হয় এমনকী এই প্রবন্ধটির অন্তর্দৃষ্টি ঢাকা পড়ে যায়। উনিশশো এগারো সালের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অজিতকুমার যে-কথাদিয়ে তাঁর প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন তা যেমন prophetic তেমনই জীবনীকার ও জীবনীর বিষয়ের মধ্যে পূর্ণ empathy -র নিদর্শন।

অজিতকুমার রবীন্দ্রজীবনীর একটি কাঠামো তৈরি করেছেন । তার মধ্যে ধরতে চেয়েছেন একটি জীবনকে, যাকে তিনি বলেছেন পরিপূর্ণ জীবন। এই পরিপূর্ণতার কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'আমাদের ব্যক্তিগত জীবন' ও দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের সাধনা ও ধর্মের সাধনার আদর্শ ওই জীবনটি। বলাই বাহুল্য যাকে truthful, definitive জীবনী বলা হয়ে থাকে এ-জীবনী তা নয়। একটি জীবনের কাছে আমরা যে-সব প্রশ্ন করি, তারই উত্তর আমরা পাইজীবনীতে। যে-কাঠামো আমরা সৃষ্টি করি ছবিটি তার মধ্যেই প্রাণ পায়। অজিতকুমারের রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী।

জীবনীরচনার প্রচলিত 'মডেল' - অস্বীকার করেই জীবনস্মৃতি শু। যেমন ধরা যাক বংশ পরিচয়ের অনুপস্থিতি। রবীন্দ্রজীবনীকারেরা রবীন্দ্রনাথের এই অনুল্লেখ সমর্থন করেননি। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী-তে পূর্বপুষদের সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। প্রশান্তকুমার পালও রবীন্দ্র - পূর্বপুষ সম্বন্ধে তথ্যাদি পরিবেশন করতে ভোলেননি। কিন্তু দুই

জীবনীকারই এই তথ্যের বিশ্লেষণে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। যে- কোনো বংশ পরিচয়েই তথ্যের অসম্পূর্ণতা বা অকিঞ্চিৎকরতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকের কৌতূহল শুধু তথ্যপুঞ্জে নয়, কৌতূহল পূর্বপুষদের চরিত্রের সঙ্গে জীবনীর বিষয়ীর উত্তরাধিকারে। কৃষ্ণ কৃপালনী এই রকম একটা কৌতূহল দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা বলে থাকি, ছিল নাকি দ্বারকানাথের সঙ্গে কোনো বংশানুগত উত্তরাধিকার ? 'Ij could not persuade myself that Rabindranath derived his many splendoured genius from the redoubtable Maharshi, austere and single- minded, seated solemn and aloof on a Himalayan peak of religious contemplation. Rabindranath though he was proud to deem himself a beloved disciple of his father, was most unlike the Maharshi, except when he chose to done a prophets role and preach sermon form the pulpit or platform turned pulpit. He was not only myriad-minded as a literary phenomenon, but was a very genuine and ardent (though seemingly somewhat passionless) lover of life in all its manifold play. His feet were planted firmly on earth and his eye observed calmly, but not unoften with a Shavian twinkle of amusement, what went around him, even while he wrote his exquisite religious lyrics which brought him world fame. I also discovered that as he grew older and the Maharshi's spell on him weakened, he was steadily liberated from his earthen inhibitions, became more liberal-minded, more tolerant of dissent, of the unfamiliar, even of the wayword, more universal in outlook, he sympathises transcending his race, religion and nation. 'I became curious to look into his ancestry, beyond the Maharshi's magic curtain…'Thus I stumbled against Dwarakanath about whom hardly any mention was made in the family or at Santiniketan where I spend many a year.'

বংশগত উত্তরাধিকার নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বহু জীবনীকারেরই উৎসাহের বিষয়, আত্মজীবনী রচয়িতারা অনেকে এ-ব্যাপারে উৎসাহী। এর বিপদও আছে যথেষ্ট। শুনেছি হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তার হাতের হ্রস্বতার কারণ তাঁর পিতামহের হাত ছিল ছোট, আর অন্যের খুঁত ধরার প্রবণতা নাকি তিনি পেয়েছিলেন তার পিত ামহেরই কাছ থেকে। এ-ব্যাপারটা পরলোকগত পিতামহের সঙ্গে জীববিজ্ঞানী নাতির রসিকতা না জীবনতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণব াদের একটি স্থুল নিদর্শন তা আমি জানি না। তবে মেণ্ডেল-তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত Dickens (১৯৯০) রচয়িতা বিখ্যাত জীবনীকার পিটার অ্যাত্রয়ড-ও (Peter Ackroyd) মনে করেন

There is no doubt that, in the loves of writers, the shadows of a grandfather or grandmother (most potent even when they are not clearly discerned) can be seen lying across the paths they follow. It is as if the peculiar chemistry of genius sometimes skips a generation, as if it is the nature of the grandparents, which really accounts for temperament and even behaviour of the one who comes after them.

এই সূত্র ধরে অ্যাত্রয়ড ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর পিতামহ - পিতামহীর রক্তসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন। ডিকেন্স তাঁর পিতামহ উইলিয়াম -এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন কার্পণ্য, বিবেচনার ক্ষমতা এবং পরিচালনা দক্ষতা। পিতামহী ছিলেন বিশ্বাসী, দক্ষ এবং গল্প বলায় নিপুণ। ডিকেন্সের জন্মাবার দু-বছর আগে তাঁর মায়ের বাবা টাক া তছপের জন্য অভিযুক্ত হয়ে Isle of man -এ পালিয়ে যান। অ্যাত্রয়ড প্রশ্ন তুলেছেন, 'Is it not appropriate then, that the major themes within his novels lie in the making and spending of money, and the effect that their persuit can have in families ? Certain themes, it seems run in the blood ?'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকারেরা যে জেনেটিকস্ শাস্ত্রের যান্ত্রিক ব্যবহার করেননি সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদ ার্হ। কিন্তু আমার মনে হয় এ -ব্যাপারে তাঁদের কৌতূহল যদি থেকেও থাকে রবীন্দ্রনাথের নৈঃশব্দ এবং উদাসীনতা তাদের কিছু পরিমাণে নিরস্ত করেছে।

জীবনস্মৃতি-তে পূর্বপুষদের কথার অনুল্লেখের একটা যুক্তি হল এর গঠন। এর বৈশিষ্ট্য হল রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি তা

রিখেরও উল্লেখ করেননি। না তাঁর জন্মের, না বিদ্যালয়ে যাওয়ার, না জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনার। এ এমন এক জীবনকথা যেখানে 'আমি'-র ঐতিহাসিক পরিচয়ের গুত্ব দেওয়া হয়নি। এ নির্দিষ্টকালের ইতিহাস নয়। এর গঠন উপন্যাস বা আখ্যানের। এর সূচনা অ্যারিস্টটলীয় কাহিনীর, এমন এক কালচিহ্র, যার আগে কী আছে বা ছিল তা নিতান্তই অব ান্তর। ইতিহাস - রীতির তুলনায় এ-সূচনা নিতান্তই আকস্মিক
আমরা নিটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুইবছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুমাহ াশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শু হইল। কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই।
বংশপরিচয় নয়, পরিবার পরিচয় নয়, জীবনকথা শু হয়েছে স্মৃতির প্রত্যুষলোক থেকে। আমার স্মৃতিই আমার জীবন। স্মৃতি আছে আমি তাই আছি। যখন থেকে স্মৃতি তখন থেকে আমাদের ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক জীবন। তার পূর্বের অস্তিত্ব অন্যের সাক্ষ্যনির্ভর, অন্য তথ্যনির্ভর। আমাদের জন্মদিন আমাদের জাগ্রত স্মৃতিলোকে নেই। আছে স্মৃতির ধারণশক্তির সীমার ব াইরে। জীবনস্মৃতির গঠনের মূলে আছে স্মৃতি। সেজন্য এর কালবোধ স্বতন্ত্র। সভ্যতার বোধও স্বতন্ত্র।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় জীবনস্মৃতি-র কালগত অনির্দিষ্টতা। যে - ভাবে প্রাচীনেরা বা এখনও নিরক্ষর সমাজে যে-ভাবে কোনে া প্রাকৃতিক ঘটনা বা কোনো স্মরণীয় ঘটনাকে কাষ্ঠা ধরে কাল নির্ণয় করা হয় রবীন্দ্রনাথ সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্র াচীন সমাজে এবং নিরক্ষর সমাজের এই কালবোধ mythical, সন তারিখ সমন্বিত ঐতিহাসিক কাল নয়। এখানে ঘটনার কাল নির্দিষ্ট নয়, ঘটনার পরম্পরাবোধই কালবোধের সূচক। জীবনস্মৃতি-র বাক্য ব্যবহার দেখুন

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম ...
তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক...আমাদের পড়াইতেন...
একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল ...
ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল। মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাত লইয়া যাইবেন ...
এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাতিন শিখাইতে আসিতেন ...

এই ধরনের বাক্য জীবনস্মৃতি-র আখ্যানের প্রধান বাক্য। যখন - তখন সেই সময়, অমুক ঘটনা ঘটে তখন -- ইত্যাদি এই ব াক্যের গঠন। প্রত্যেকটি বাক্যেই কালের প্রেক্ষিত দেওয়া হয়েছে কিন্তু নির্দিষ্টতা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাগুলি প্রভ াতকুমার বা প্রশান্তকুমারের জীবনীতে পাওয়া যাবে। সেখানে তাঁদের চেষ্টা কালের নির্দিষ্টকরণ। রবীন্দ্রনাথ যে mode বা আখ্যান বলার রীতি অবলম্বন করেছেন সেখানে শুধু স্মৃতির পুনর্জ্জীবন, তার পেছনে অবশ্যই একটা কালানুক্রমিকতা লুকিয়ে আছে। তিনি চৈতন্যপ্রবাহে ভেসে যান না, ওলটপালট হয় না ঘটনাগুলি, মোটামুটি ক্রমটা থাকে, শুধু চেষ্টা থাকে ইতিহাসের কাঠামোটাকে লুকিয়ে রাখার। আর যেহেতু স্মৃতির পুনর্জ্জীবন করতে চান, তাতে মিশ্রন ঘটে যায় কল্পনার। স্মৃতিলোক থেকে টেনে - তোলার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক
কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'... আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।

এই বাক্যটি নিয়ে অনুসন্ধানী পণ্ডিতেরা বিস্তর গবেষণা করেছেন এবং আমরা জেনেছি যে এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ জল পড়িতেছে পাতা নড়িতেছে বাক্য দুটি পরিবর্তিত করেছেন। জীবনীকারেরা বলেছেন এই বাক্য দুটি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় পড়া কোনো বইতে নেই, 'জল পড়িতেছে পাতা নড়িতেছে' -র একটা হ্রস্বীকরণ রবীন্দ্রনাথ করে নিয়েছেন। যদিও জানা গেল না, কবে এই জল পড়িতেছে, পরিবর্তিত হল 'জল পড়ে'--তে। কিন্তু তিনি যে বলেছিলেন এটি 'আদিকবির প্রথম কবিতা' সেটাও কি অসত্য ? এই বাক্য দুটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই রচনা আসলে এর মূল বক্তব্যটা বাক্যদুটির ঐতিহাসিক রূপের সত্যতার নয়, মিল নিয়ে কানের সঙ্গে মনের খেলার সম্পর্ক এর বক্তব্য। বলা চলে বাক্য দুটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক কবিতা আবিষ্কার করেছিলেন। সেটিই তাঁর স্মৃতিতে বিলগ্ন হয়ে আছে। পঞ্চাশ বছর

ধরে তিনি স্মৃতিতে যা ধারণ করে আছেন তা শুধু দুটি বাক্য নয়, তা হল 'সেদিনের আনন্দ', এর মূল্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধের উজ্জীবনে আর সেই উজ্জীবনের স্মৃতির পুনদ্রেকে। একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৈলাস মুখুজ্যের মুখে শোনা ছড়া ---দ্রুত উচচারিত অনর্গল শব্দছটা আর ছন্দের দোলা, আর বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ছড়া---'শৈশবের মেঘদূত'। এইরকমই একটা ঘটনা রামায়ণ পাঠ। এর সত্য-মিথ্যা প্রমাণ অসম্ভব। কিন্তু বুঝতে হবে কেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি একে ধারণ করে আছে। আর কী কারণে জীবনের সত্য ঘটনায় অনুসন্ধানীদের প্রবেশ এখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
দিদিমা, আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া মলাট -ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা, সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো -একটা কণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়ে জল পড়িতেছে, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে স্থান, কাল, সমস্ত কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না কি রবীন্দ্রনাথ একটি অস্পষ্ট স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন একটি মনোরম মুহূর্ত। রবীন্দ্রনাথের মনে আছে সবই, সেই রামায়ণ, তার মলাট, অন্তঃপুরের আঙিনা, সেদিনের মেঘে-ঢাকা বিকেল, কিন্তু মনে নেই রামায়ণের কোন কণ বর্ণনায় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, কোন বর্ণনার জন্য তার এমন নিপুণ আয়োজন? জীবনী রচয়িতার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো গবেষণাই এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ব্যর্থ। জীবনস্মৃতি আত্মকথা, জীবনী অন্যের কথা। আত্মকথার সঙ্গেই অন্যকথার পার্থক্যটা এইখানে জীবনস্মৃতি -তে আছে নানা মানুষের কথা, তারা সবাই ঐতিহাসিক এই অর্থে যে তারা কেউ কালগত চরিত্র উপন্যাসের চরিত্রের মতো। তা সত্ত্বেও তাদের একদলের ঐতিহাসিকতার গুত্ব সামান্য। রাজেন্দ্রলাল সিং কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র, কিংবা বিদ্যাসাগর এক ধরনের চরিত্র। আরেক ধরনের চরিত্র কৈলাস মুখুজ্যে, কিংবা ভৃত্য শ্যাম, স্পেনের ফাদার হেনরি। এঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ছাড়া অন্য কোনো তথ্য নেই। জীবনীকারেরা এখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে অপারগ। এমনকী খ্যাতনামা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও যে-সব ঘটনা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তাদের কোনো প্রমাণ নেই। অন্য তথ্যের সমর্থন নেই। এখানেও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ নেই জীবনীকারের। অথচ এসব ক্ষেত্রে স্মৃতিবিভ্রম যে হতে পারে না তা তো নয়। এখানেও স্মৃতির সম্পাদনা চলেছে অবিরাম। রমেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে 'বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে- মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।' রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলি পাঠককে জনালেন না। এটি বিনয়বশত, স্মৃতিবিভ্রম বশত নয়। অর্থাৎ এখানে চলেছে স্মৃতির সম্পাদনা। এই প্রসঙ্গে বলি যে জীবনস্মৃতি-র প্রথম খসড়ায় সঙ্গে জীবনস্মৃতি-র চূড়ান্ত রূপ (মুদ্রিত রূপটি) মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাব যে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বহু তথ্য বাদ দিয়েছেন এবং অনেক ঘটনার পরিবর্তন করেছেন। প্রথমেই ধরা যাক প্রথম খসড়ার ছিল রাশিচত্র, জন্মকাল। চূড়ান্ত খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ তা বাদ দিলেন। তাঁর জীবনের আদি কবিতার প্রসঙ্গ যা নিয়ে পরবর্তী গবেষকেরা বহু অনুসন্ধান করেছেন, প্রথমটিতে তার কোনো স্থানই ছিল না। 'কাব্যরচনা চর্চা' নামে একটা অংশ ছিল প্রথম খসড়ায়। চূড়ান্ত খসড়ায় তা পরিত্যক্ত হয়।

সৌভাগ্যবশত য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র এবং য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী নামক দুটি বইতে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কিছু কথা পাওয়া যায়। দুটিই প্রকাশিত হয়েছিল জীবনস্মৃতি রচনার আগে। জীবনস্মৃতি -তে আছে রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কথা, ১৮৮৬ সাল অর্থাৎ কড়ি ও কোমল কাব্যের প্রকাশকাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে সতেরো বছর বয়সে বিলাত যান। ফিরে আসেন এক বছর পাঁচ মাস পরে ফেব্রুয়ারি ১৮৮০-তে। জীবনস্মৃতি-তে স্বাভাবিকভাবে এই এক বছর পাঁচ মাস সময়ের কথা বেশ কয়েকটি অথ্যায়ের বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাত থেকে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিলাতযাত্রার কথাও আছে। কিন্তু 'বিশেষ কারণে মাদ্রাজে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতয় ফিরিয়া আসিতে হইল।' কিন্তু বিশেষ কারণটি কি তা জীবনস্মৃতি-তে বলা হয়নি।'কারণ শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাসিটা ষোলআনা আমারই প্রাপ্য নহে। এইজন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না।' কিন্তু এটুকু জানালেন যে 'লক্ষ্মীর

প্রসাদ লাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি।' কেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটা তুললেন অথচ পাঠকের কৌতূহল না মিটিয়ে এড়িয়ে গেলেন তা বোঝা গেল না। জীবনীকারেরা অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। অর্থাৎ আত্মজীবনী যেখানে মৌন থাকতে চায় কিংবা অস্পষ্ট থাকতে চায়, জীবনীর কাজ সেখানে মুখর হওয়া কিংবা স্পষ্ট করে দেওয়া।

'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।... সে আপনার অভিচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কীরাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে।'(৪৬) এই 'কে' শুধু এক অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তিমাত্রনয়, তা ব্যক্তির নিজস্ব 'অভিচি'--ও বটে, ব্যক্তির চেতন - অবচেতন মনও বটে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুত্ব বদলে যায়। কোনো কোনো ঘটনা ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। কোনো কোনো ঘটনা চৈতন্যে থেকে যায় কিন্তু তাকে পুনর্জ্জীবিত করা যায় না। অন্যদিকে চিঠিপত্র, দলিল, ডায়েরিতে যা কিছু থেকে যায় তার অস্তিত্ব স্থির ও স্থাবর। আত্মজীবনী এই পরিবর্তনমান অভিচির খেলা, চেতন - অবচেতন মনের টানাপোড়েন। জীবনীকার, ঘটে- যাওয়া সমস্ত ঘটনারই সংগ্রহক। তাঁদের যে-তথ্য উপেক্ষা করা এবং তথ্যের গুত্ব নর্ধারণের পক্ষপাতিত্ব নেই একথা বলব না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-প্রবাসীর পতত্র এবং জীবনস্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা দুটি আলাদা রচনায় একই সময়ের কথা বলতে গিয়ে যে-সম্পাদনা করেছেন জীবনকাহিনীর এমন সুযোগ জীবনীকারের হওয়া সম্ভতব নয়। জীবনস্মৃতি-র সঙ্গে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র মিলিয়ে দেখলে স্মৃতি ও অভিচির সম্পর্কটা স্পষ্ট হবে। জীবনস্মৃতি-তে একটি লোকের কথা আছে আর আছে রিজেন্ট উদ্যানের সামনে এক বাড়ির কথা।
এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা, গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়, শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকেশীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। এক - একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত।

ব্যক্তিটির খুঁটিনাটি বর্ণনা ---শারীরিক ও ব্যবহারিক -- দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর বয়সেও এই ল্যাটিন শিক্ষকের স্মৃতি তাঁর মনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। লোকটির পাগলামি ছিল, বাতিক ছিল। এই লোকটির নাম রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল না কিন্তু 'অনশনক্লিষ্ট' দরিদ্র ভাবুকটির জন্য তাঁর বেদনাবোধ হত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় য়ুরোপ - প্রবাসীর পত্রে, না আছে এই রিজেন্ট পার্কের সামনের বাড়ির কথা, না আছে এই পাগল সাহেবের উল্লেখ। এদেরঅনুল্লেখ হয়তো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যখন দেখি জীবনস্মৃতি -তে সেই বাড়ির এবং এই মানুষটির বিশদ বর্ণনা, তখন য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে তাদের অনুপস্থিতি বড় রহস্যময় মনে হয়। যে-স্মৃতি আজ এতদিন পরেও উজ্জ্বল, তার সামান্যতম স্পর্শ নেই তাঁদের অস্তিত্বের যখন সেই মানুষ ও সেই বাড়ি ছিল জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সেই স্মৃতি চিল কোথাও লুকিয়ে, আজ হঠাৎ দেখা দিল তেত্রিশ বছর পরে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে ঘটনার অভাব নেই, মানুষের অভাব নেই। এখানে পাই এক মিসেস স্কটকে, সেই মহিলা ও তাঁর বাড়ির আতিথ্যের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'সেই গৃহটি আমার মনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।' অথচ এই বাড়ি ও এই মহিলার কথা য়ুরোপে-প্রবাসীর পত্রে কোথাও স্থান পেল না। প্রাত্যহিকের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল এই বাড়ি, এই মহিলা। সময়ের দূরত্ব আজ তাদের ফিরিয়ে আনল। একেই বলতে চাই স্মৃতির সম্পাদনা।

ছেলেবেলা লেখা হল ১৯৪০ সালে। জীবনস্মৃতির থেকে তার প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় তিরিশ বছর। জীবনস্মৃতির কাল- পরিসর ছিল পঁচিশ বছরেরও কম। ছেলেবেলা-য় সেটি আরো সংকীর্ণ হয়ে এল, প্রথমবার বিলাতযাত্রা পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনের প্রথম সতেরো বছর। এই প্রথম সতেরো বছরের কাহিনী জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, এই তিনবারতাঁর জীবনের ক

াল-পরিসরকে তিনি সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর করে আনছেন। ছেলেবেলা-র কাল-পরিসর সবচেয়ে ছোট। আর এই জীবনীতে সবচেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে অতীত ও বর্তমানের দ্বৈততা। জীবনস্মৃতি- তে রবীন্দ্রনাথ সেকাল-একালের ব্যবধান নিয়ে চিন্তিত নন একেবারে। কখনও যদিও বা পুরোনো কালের কথা এসে পড়ে তা আকারে ইঙ্গিতে। ছেলেবেলা-র প্রথম কথাই হল 'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়'। তারপর চলে বিস্তৃত বিবরণ । সেকালের যানবাহন, মেয়েদের পোশাক, সন্ধ্যেবেলার বেড়ির তেলের আলো, কলসি ভরে গঙ্গা থেকে জল আনা,পুরোনো দিনের পালকি, আর চারপাশের ম ানুষের কর্মের জগৎ, বাড়িয়ে ভেতরে তাঁতীনিদের শাড়ির বিত্রি। উঠোনে বাস ধনুরির তুলো ধোনা। কানা জীবনযাত্রার ছবিতে ছেলেবেলা ভরা। জীবনস্মৃতি-র কেন্দ্রীয় বাক্যগুলির গঠনে যেমন এক কালের অনির্দিষ্টতা, ছেলেবেলার কেন্দ্রীয় ব াক্যগুলিতে রয়েছে কালের বৈপরীত্য। দু-একটি উদাহরণ দিই

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি ...
আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না ...
তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজার ...
তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি, যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছ াদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের।...
...এই কাগজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, তখন হত নাড়ু কোটা, যখন দাসীরা সন্ধ্যেবেলায় বসে উতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে।...

জীবনস্মৃতি এবং ছেলেবেলা দুটি আখ্যানেরই ঐতিহাসিক কাল মোটামুটি এক কিন্তু তাদের কথকের বর্তমান আর অতীতের বোধটা হয়ে গেছে আলাদা। জীবনস্মৃতি-র সময়ের মধ্যে দূরত্বের বোধ কোথাও তীব্র নয়, ছেলেবেলা-র সময়ের সঙ্গে কথকের দূরত্ব শুধু কালের দিক থেকে দীর্ঘতরই নয়, সময়ের চরিত্রগত পার্থক্যটাও বড় বেশি। তাই এর-কেন্দ্রে যেমন রয়েছে একটি বালক- তণের জীবন, তেমনই রয়েছে এর কথকের (যিনি বৃদ্ধ) মনের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের সচেতনতা। শুধু একজন মানুষের ছেলেবেলা নয়, ঘটনা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ইতিহাস, সময়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনা তাঁর দিক থেকে চলেছে। জীবনস্মৃতি-র অনির্দিষ্ট সময় এখন নির্দিষ্টতার মধ্যে দিতে চাইছে। সময়ের ব্যবধানের বোধ নিয়ন্ত্রণ করতে চ াইছে বৃত্তান্তগুলিকে। আর তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখন দেখতে চাইছেন তাঁর সমগ্র জীবনকে। খণ্ডের বর্ণনার মধ্যে তিনি অখণ্ডজীবনকে বুঝতে চাইছেন।

'আত্মপরিচয়'--এ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জীবনদেবতা তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তার ভালো - মন্দ সব কিছু মিশিয়ে একটা চরিতার্থতার দিকে নিয়ে চলেছেন। তার চল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের গড়ে ওঠার বর্ণনায় ব্যবহার করলেন মূর্তিগড়ার রূপক। ছেলেবেলা তৈরি হয়েছে মাটি দিয়ে। 'উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি--- কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি।' (৪৮) তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'জীবনের গোড়াকার কাঠামে াটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাইনি। নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত - মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।'

নিজের জীবনের যে - সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ এখানে ঘোষণা করলেন ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের সামনে তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। জীবনীকারকে তো শেষপর্যন্ত একটি জীবনকে ব্যাখ্যা করতে হবে। দেশি এবং বিদেশি কারিগরি দুই মিলেই রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু কারিগরির রহস্য ব্যাখ্যার দায়িত্ব জীবনীকারের। 'ছেলেবেলা' তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনার একটা পথনির্দেশও বটে।

জীবনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা ভয় ছিল, অন্তত অস্বস্তি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যই জীবন থেকে বৃত্তান্তকে বাদ দেবার এত চেষ্টা। দুটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির কল্পনা করেছিলেন জীবনের মধ্যে। একজন কবি, প্রাত্যহিকতার থেকেস্বতন্ত্র, ঐতিহাসিক

স্পর্শ শূন্য। একটি সংরচনা। আর একজন ঐতিহাসিক মানুষ বা
মানুষ আকারে বন্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভারে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে।

তারই জীবনচরিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই জীবনচরিতে কবিকে পাওয়া যাবেনা। নিজের জীবনী পুরোটা মহত্ত্বের প্রতিচ্ছবি না হোক, অন্তত কিছুটা গৌরবজনক হোক এ আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক নয়। য়ুরোপ-যাত্রীর খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ হারানো টাকার ব্যাগ ফেরত পাবার ঘটনা উল্লেখ করে পরিহাসছলে লিখেছিলেন, 'যখন আমার biography বেরোবে তখন এই-সমস্ত অন্যমনস্কতার দৃষ্টান্তগুলো পাঠকদের কাছে ভারী আমোদজনক এবং কবির উপযুক্ত শোনাবে...'

আত্মজীবনীতে নিজের বাহাদুরির কথা লেখা হয় না তা নয়, নিজের স্খলন-পতন নিয়েও যে আস্ফালন করা সম্ভব অনেক আত্মজীবনী তার নিদর্শন। সত্যভাষণেও অহমিকার প্রকাশ হতে পারে। তাই আত্মজীবনীর পথ যথার্থই দুর্গম এবং ক্ষুরধার। অনর্থক বিনয়ে সত্য গোপন সম্ভব আবার সত্যভাষণের দুর্জয় স্পৃহায় উদ্ভাসিত হতে পারে অহমিকা। আত্মজীবনীতে তাই অনেক বৃত্তান্ত তার স্বরূপে দেখা দেয় না, রবীন্দ্রনাথকেও সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জীবনের পরিসরটিকে ছোট থেকে ছোট করে নেওয়ার পিছনেও আছে বৃত্তান্ত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা, সমস্যাকীর্ণ জীবনের মধ্যে প্রবেশ না-করা। এখানেই জীবনীকারের কাজ শু। কোন যুক্তিতে তিনি 'সত্য' গোপন করবেন, কোন যুক্তিতে তিনি অস্বস্তিকর সমস্যাকে তামসিক বলে ঘোষণা করবেন। আধুনিককালের জীবনরচনার যে - ধারা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯১৮ সাল থেকে লিনটন স্ট্র্যাচির এমিনেন্ট ভিক্টোরিয়ানস প্রকাশিত হবার পর, তার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শ্রদ্ধাহীনতা। তার বিশেষ প্রভাব বাংলাদেশে দেখা যায়নি। তারপর থেকে পশ্চিমে জীবনীকাররা যে ভূমিকা নিয়েছেন সেখানে অন্যের জীবনের নিভৃতিতে প্রবেশ করার মধ্যে নৈতিকতার অভাব আছে কি না তা হয়ে উঠেছে অবান্তর। জীবনীকার ঐতিহাসিক, জীবনীকার সত্যান্বেষী, জীবনীকার নির্মম। তাই আত্মজীবনী ও জীবনীতে যে দ্বন্দ্ব ছিল আবহমান তা এখন চরমে উঠেছে। পশ্চিম - যাত্রীর ডায়রী-র উদ্ধৃতি এখানে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দীর্ঘ, তার ঘটনা বিপুলও বিচিত্র। তাঁর আত্মজীবনীতে মাত্র পঁচিশ বছরের বিবরণ আছে। বাকি জীবনটিতে জীবনীকারের ও আত্মজীবনীকারের সংঘাতের সমস্যা নেই, যদিও সেই দীর্ঘকালখণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে রবীন্দ্রজীবন আলোড়িত হয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু প্রথম পঁচিশ বছরের যে-বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার মধ্যে এমনই সম্পাদনা আছে, ঘটনাকে প্রান্তিকায়িত করার চেষ্টাকে অস্বীকারের চেষ্টা আছে, যেখানে জীবনীকারেরা তাঁর বক্তব্য সংশোধনে প্রবল উৎসাহী।

ছেলেবেলা এবং জীবনস্মৃতি-কে যেমন তাদের প্রকাশকালের ক্রম হিসেবে পড়া চলে তেমনই তাদের ঘটনাক্রমের দিক থেকেও পড়া যায়। জীবনস্মৃতি-র কিছুটা কাল- পরিসর ছেলেবেলা-য়ও অর্থাৎ রবীন্দ্রজীবনের প্রথম সতেরো বছরের কাহিনী হিসেবে ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতি-র কিছু অংশ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। দুটিতেই যে-জীবনখণ্ডের কথা বলা হয়েছে তা মূলত সমস্যাহীন। সুরক্ষিত নিরাপদ জীবনে কোনো কষ্ট ও অভাবের চিহ্ নেই। এমন কি ভৃত্যরাজতন্ত্রের যে-অত্যাচার তাও কৌতুকে সমুজ্জ্বল। কোনো বিশেষ পীড়া, বিশেষ দুঃখ, বিশেষ গ্লানিতে স্পৃষ্ট নয় রবীন্দ্রনাথ। বালক বা কিশোর, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে যে সংবেদনশীল ও কৌতুকপ্রিয় যুবকটিকে আমরা দেখতে পাই তাকেও অনেকটা সংঘাত করে জীবনস্মৃতি-তে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতিতে দেখতে পাই একটা জীবন, যে জীবন কাটছিল আনন্দে, সুখে, নানা তৃপ্তিকর কাজে, সাহিত্য ও সংগীতের আবহাওয়ায়, পত্রপত্রিকায়সম্পাদনায়, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সমর্থনে, তর্কবিতর্কে যোগদান। পরিণত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবন কাটছিল 'গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো'।

ছেলেবেলা-ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের কাহিনী, এক বালকের কৈশোর যৌবনে উত্তীর্ণ হবার কাহিনী। কাহিনীটি শেষ হবার মুখে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করলেন একটি ঘটনার কথা যা তিনি জীবনস্মৃতি -তে বলেননি। অথচ বলার অবকাশ ছিল, এমনকী আয়োজনও ছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল বিলেত যাবার ঠিক মুখে। সেই সময়ের বর্ণনা জীবনস্মৃতিতে রয়েছে ভালোভাবেই। অতএব ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি থেকে চলে গিয়েছিল এমন মনে করার কোনো সংগাত কারণ নেই। কী কারণে রবীন্দ্রনাথ সেই ঘটনাকে, সেই ঘটনার কেন্দ্রে যে মানুষ তাকে, অদৃশ্য করে দিতে চেয়েছিলেন?

সে-কথা হঠাৎ জানালেন ছেলেবেলা-য় জীবনের শেষে। একটু যেন ঔদাসীন্যের সঙ্গেই। রবীন্দ্রনাথ জানালেন বোম্বাই-এর এক গৃহস্থঘরের মেয়ের কথা। বিলেত থেকে তাঁর শিক্ষা। ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ। তণীটি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেছিলেন, তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন। যে কবিতা শুনে তণীটি বলেছিলেন, 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেননি। অথচ ছেলেবেলাতে শুধু সেকথাবললেন তাই নয়, তাঁর ছেলেবেলা-র কাহিনী শেষ হল এই কাহিনী দিয়ে । তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ পরিচয় দিলেন না। তাঁর নাম (নিশ্চয়ই তঁার নাম রবীন্দ্রনাথ ভুলে যাননি), তাঁকে বললেন 'আপন মানুষের দূতী'। আর একটি দার্শনিকতার ফুলকাটা কাজের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে চাইলেন সব কিছু।

ব্রহ্মচার্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চাশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে এ-ঘটনা বলতে হয়তো অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। পরে স্মৃতিচারণের অনেকটা সহজভাবেই একথা স্বীকার করতে পেরেছিলেন। অনুসন্ধিৎসু গবেষকেরা এই ব্যক্তিগত আলো-আঁধারের জগতে ঢুকতে অবশ্য দ্বিধা করেননি। আমরা এখন অনেক কিছু জেনেছি।(৫১) সজনীকান্ত দাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এই তণীর চিঠি আবিষ্কার করেন।(৫২) সজনীকান্ত চিঠিটি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তোমরা রবীন্দ্র-যাদুঘর যদি করিতে চাও, এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও।' রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী ভাষায় বলেছিলেন তাতে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু চিঠি পড়ার পর এই তণী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। ১৮৭৮ সালে তণী তড়খড়ের লেখা চিঠিটি রবীন্দ্র- জীবনীর অতি মূল্যবান একটি বৃত্তান্ত

Thank you very much indeed for sending me the entire publication of কবি কাহিনী though I have the poem myself in the numbers of ভারতী in which it was first published and which Mr. Tagore was good enough to give me before going away, and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart.

অনেক তথ্য জানা গেল। বিলেত যাবার আগেই রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনীর একটা ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন, অবশ্য মুখে মুখে ; ইংরেজবাসীর জন্য নয় ; যা করবেন ভবিষ্যতে, তখন করেছিলেন একটি তণীর জন্য। এই চিঠি আর ছেলেবেলায় এই 'আপন মানুষের দূতী'-র স্মৃতিচারণের মধ্যে কি কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আছে ? বিচ্ছেদের বেদনা আছে ছেলেবেলায়, কিন্তু চেষ্টা আছে সেই তণীটিকে নামহীন রূপহীন স্মৃতিসমুদ্রে লীন করে দেবার। এইখানে ছেলেবেলা-র সমাপ্তি।

জীবনস্মৃতি আখ্যানের সমাপ্তিও একটি বিশেষ ঘটনায়। ছেলেবেলা-র সঙ্গে তার পার্থক্য এইখানে, ছেলেবেলা-র সমাপ্তি বিচ্ছেদের বোধে, আর জীবনস্মৃতি-র শেষ মৃত্যুবোধে। দুই ক্ষেত্রেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এক দার্শনিক নির্লিপ্তিতে এক বিচ্ছেদ ও এই মৃত্যুকে জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, মায়ের মৃত্যু যা তাঁর জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, তা তাঁর জীবনে কোনো স্থায়ী ছায়া ফেলেনি। যদিও অনেকদিন পরে মায়ের সমৃতি ফিরে এসেছিল সূক্ষ্মভাবে, প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও কোমলতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল মায়ের স্মৃতি। 'কিন্তু, আমার চবিবশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিশিয়ে অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।'(৫৩)

'চবিবশ বছর বয়সের সময়'---জীবনস্মৃতি-র কালের অনির্দিষ্টতার জগতে এই একটি নির্দিষ্ট কালবিন্দু। এখান থেকে জীবনের আখ্যান ইতিহাসের জগতে প্রবেশ করবে। ছেলেবেলা-তেও এইরকম একটা কালবিন্দু, একটা ইতিহাসের নির্দিষ্টতা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন বয়স তখন সতেরো। বিলেত যাবার সময়।

কিন্তু কার মৃত্যু? রবীন্দ্রনাথ কোনো কথা বললেন না। কেন সেই মৃত্যু তাঁর জীবনের পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে জড়িয়ে আছ? রবীন্দ্রনাথ অন্য ভাষায় বললেন, এই একটি স্মৃতি যা তাঁর জীবনের দীর্ঘতম স্মৃতি। প্রত্যেকটি বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে সঙ্গে যা জাগ্রত হয়ে ওঠে। 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে যিনি কেন্দ্রীয় শক্তি তিনি মৃত্যু নামক প্রাকৃতিক-জৈবিক ঘটনামাত্র নন। এর কেন্দ্রীয় শক্তি এক বিশেষ মানুষ। কিন্তু সেই বিশেষ মানুষটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করবেন না। এ এক গল্প যেখানে কোনো চরিত্র নেই। এক ইতিহাস যেখানে বৃত্তান্ত নেই। আত্মজীবনীর সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠ যেখানে অনুসন্ধানীর দল স্বভাবতই ভিড় করবেন। নৈঃশব্দের পর্দা তুলে বারবার উঁকি মারবেন। খুঁজে বার করবেন এই মৃত্যুশোকের পেছনে থাকা এক রমণীর আত্মহত্যা। আত্মজীবনীর জবানবন্দিতে সত্য উহ্য থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেন এ-তাঁর অতি ব্যক্তিগত শোক। কিন্তু তার কথা উল্লেখ করেও তিনি আখ্যান শেষ করতে পারছেন না।

এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো ধরিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া কত পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এইসময় বাধা বিরোধ বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।

এই উদ্‌ঘাটন কর ক্ষমতা কি জীবনীকারের আছে ? জীবনী আত্মজীবনীর পরিপূরক না জীবনী আত্মজীবনীর প্রতিবাদ শক্তি?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com